কৃষ্ণ-কর্ণ-সংবাদ : এক অভিনব বার্তা

অরিন্দম দাস

অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি। ভারতীয় রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র হস্তিনাপুরে আয়োজিত হয়েছে একটি বিশেষ সভা। তেরো বছরের বনবাস শেষে পাণ্ডবরা দুর্যোধনের কাছে ফেরত চেয়েছেন তাঁদের অপহৃত রাজ্যপাট। দুর্যোধন অনড়—'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।' দেশব্যাপী এক ভয়ংকর কালো ছায়া বিস্তৃত হয়েছে যুদ্ধের আশঙ্কায়। মহামারির হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিপ্রস্তাব নিয়ে এসেছেন কুরুসভায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে পরিহার করার শেষ প্রয়াস। কিন্তু তাঁর সবরকম প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল—রাজনীতি-শাস্ত্রের পথ ধরে সাম অর্থাৎ আলোচনার মাধ্যমে মিটমাট এবং দান—মাত্র পাঁচখানি গ্রামের বিনিময়ে সমস্ত ঐশ্বর্য ও সাম্রাজ্য দিয়ে দেওয়া—কোনওটাই ফলপ্রসূ হল না। পরশুরাম, নারদ, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী—সকলের নিষেধাজ্ঞা ও অনুনয় ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে দুর্যোধন অটল রইলেন যুদ্ধে পাণ্ডববধের অভিপ্রায়ে। তাঁকে মন্ত্রণা ও সাহস দিয়ে সজীব রাখলেন কর্ণ ও শকুনি। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপধারণও বিফল হল। হতাশ হয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন রাজসভা থেকে। পিসিমা কুন্তীর সঙ্গে দেখা করে উপপ্লব্য নগরে পাণ্ডবদের কাছে ফিরে যাওয়ার আগে তিনি রাজনীতির তৃতীয় পথটি গ্রহণ করলেন—ভেদ। চতুর্থ তথা শেষ পথ দণ্ড বা যুদ্ধে যাওয়ার আগে এটাই তাঁর অন্তিম প্রয়াস। রথে তুলে নিলেন দুর্যোধনের প্রিয় বন্ধু, তাঁর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বীর কর্ণকে।

কর্ণের জীবনে এ এক ক্রান্তিকাল। দেবপুত্র কর্ণ, অসাধারণ বীর; জ্ঞানে, প্রতিভায়, শক্তিতে, বুদ্ধিতে তিনি কারও চেয়ে কম নন। কিন্তু স্বরূপত দেবত্বের অধিকারী হয়েও ভাগ্যবিড়ম্বনায় এবং কিছু ভুল সিদ্ধান্তের কারণে তাঁর জীবনে এসেছে অবিচার, অভিশাপ, অসন্তোষ; দেখা গেছে অনৈতিক আচরণ। বীরত্ব ও দানশীলতার জন্য যেমন তিনি প্রশংসিত হয়েছেন, তেমনি নিন্দিত হয়েছেন অশালীন আচরণ (দ্যূতসভায়) এবং মিথ্যাবাক্যের (পরশুরামের কাছে) জন্য। বহু গুণের অধিকারী হয়েও তাঁর চরিত্র তাই নিখুঁত সুন্দর নয়। তবে একটা অদ্ভুত বিবর্তনরেখা পরিলক্ষিত হয় তাঁর

উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে কর্মরত ও দীর্ঘদিন মহাভারত-চর্চায় নিরত

মনোলোকে। জীবনের প্রথম প্রহরে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য বাধার পাহাড়কে পদদলিত করে চলে যাওয়ার দুর্দমনীয় তেজ, দ্বিতীয় প্রহরে অধর্মাশ্রয়ী দুর্যোধনের সঙ্গে সখ্যের ফলে একইসঙ্গে প্রতিষ্ঠা, সুখ ও ঐশ্বর্য লাভ এবং তৃতীয় প্রহরে একান্তে আত্মবিশ্লেষণ—এই বিবর্তনধারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় কর্ণের জীবনে।

তৃতীয় প্রহরের সূচনা ছদ্মবেশী ইন্দ্রকে কবচকুণ্ডল দানের মধ্য দিয়ে, তার অন্তিম মুহূর্ত এখন সমাগত। এরপর আসবে তাঁর জীবনের চতুর্থ বা শেষ প্রহর—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। কিন্তু এই তৃতীয় প্রহর, আমাদের মনে হয়, কর্ণের জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। খুব সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক এই পর্বের ঘটনাবলি।

কর্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন পিতা সূর্যদেব-প্রদত্ত কবচ ও কুণ্ডল নিয়ে। যেহেতু তিনি জন্মের পরেই পরিত্যক্ত হবেন, যথাযথ শিক্ষা-সংস্কার তাঁর হবে না, তাই তাঁর দেবত্বের প্রকাশক হিসাবে কুণ্ডল বা দুল এবং ক্ষত্রিয়ের চিহ্নস্বরূপ অভেদ্য কবচ তাঁর দেহে সংযুক্ত ছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের বিচারে এটা অবাস্তব মনে হলেও, আমাদের মনে হয়, মহাভারতের কবি এই কবচকুণ্ডলকে রূপকার্থে ব্যবহার করেছেন। দেবতার পুত্র হয়েও সূতপুত্ররূপে পরিগণিত হওয়া যে তাঁর পক্ষে চরম অবমাননাকর তা প্রকাশ করতেই এই রূপকের আশ্রয় নেওয়া। দুর্যোধনের সহায়তায় যখন কর্ণ অঙ্গরাজ্যের রাজা হয়ে এবং বহু যুদ্ধে জয়লাভ করে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, তখন বাস্তবিক তাঁর ওই কবচকুণ্ডলের আর কোনও প্রয়োজন ছিল না। আত্মরক্ষায় সমর্থ এক মহাবীর যুদ্ধে প্রাণ হারানোর ভয়ে বুকে কবচ এঁটে ঘুরে বেড়ায় না। কর্ণের মতো আত্মাভিমানী মানুষের কাছে এই কবচ মূল্যহীন। তাই স্বপ্নের মধ্যে তাঁর আরাধ্য দেবতা সূর্যদেব (তখনও কর্ণ জানেন না, তিনি সূর্যপুত্র) যখন তাঁকে নিষেধ করলেন পরদিন ব্রাহ্মণ-ছদ্মবেশী দেবরাজ ইন্দ্রের ভিক্ষাপ্রার্থনায় তাঁকে কবচকুণ্ডল দিয়ে দিতে—তখন কর্ণ সত্যিই একথার কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পাননি; বরং তাঁর মনে হয়েছিল—এই দানের ফলে, মানুষ হয়ে ভিক্ষাপ্রার্থী দেবরাজকে অনুগ্রহ করলে তাঁর যশ বহুগুণে বিস্তৃত হবে। তিনি এই যশই চান—অর্জুনের পিতাকে ভিক্ষাদান করে। তবে একটা চিন্তা তাঁর মনে ছিল—কুণ্ডল দান করলে তাঁর সৌন্দর্যহানি হবে না তো? পুত্র অর্জুনের চিন্তায় কাতর ইন্দ্রদেব কর্ণের কাছ থেকে কবচকুণ্ডল নেওয়ার লোভে তাঁকে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন, কর্ণের সৌন্দর্য এতটুকু ক্ষুণ্ণ হবে না এবং দাতা হিসাবে তাঁর যশ চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। তবে এক্ষেত্রে দানের মর্যাদা সম্পূর্ণত রক্ষিত হয়নি। সূর্যদেবের পরামর্শে কর্ণ ইন্দ্রের কাছ থেকে একাঘ্নী বাণ চেয়ে নিয়েছিলেন—তাঁর দানের পরিবর্তে। প্রতিদান নিলে দান মাহাত্ম্য হারায়।

এই ঘটনার কিছু কাল পর কর্ণের এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হল। বিরাট রাজ্য আক্রমণ করায় বৃহন্নলা-বেশী একা অর্জুনের কাছে হেরে বিধ্বস্ত হলেন তাঁরা সকলে—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ এবং তিনি নিজেও। অর্জুনের অনন্যসাধারণ অস্ত্রদক্ষতা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেদিন বারংবার তাঁর কাছে পর্যুদস্ত হয়ে। যুদ্ধের আগেই কর্ণ বুঝে গিয়েছিলেন—একা অর্জুনেরই যদি এই ক্ষমতা হয়, তবে তাঁর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকিরা যুক্ত হলে তাঁদের কী অবস্থা হবে!

তবুও দুর্যোধনকে খুশি রাখতে এবং অর্জুনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের উদগ্র আকাঙ্ক্ষাতে কর্ণ কৌরব শিবিরে যুদ্ধের উন্মাদনাকে সদা জাগ্রত রেখেছিলেন। এমনকী যুদ্ধের পক্ষে সওয়াল করতে তিনি বারেবারে তর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন ভীষ্ম ও দ্রোণের সঙ্গে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি অতিক্রম করে গিয়েছিলেন শালীনতার মাত্রা। কিন্তু

একান্তে, হয়তো, যুদ্ধের পরিণাম তিনি বুঝেই গিয়েছিলেন। অর্জুনের অস্ত্রদক্ষতা ও কৃষ্ণের দৈবী ক্ষমতার কথা ভেবেই নয়, কর্ণ এটা বুঝেছিলেন তাঁর বন্ধু দুর্যোধনের এতাবৎ অন্যায় কর্মের কথা চিন্তা করেই। কর্ণের অর্থ, যশ ও প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় হয়তো তাঁর মনে তাগিদ অনুভূত হয়েছিল আত্মবিশ্লেষণ করার। আর ঠিক এই পরম লগ্নে তাঁর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎ হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যেমন, কর্ণের ব্যক্তিগত জীবনের নিরিখেও এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার ছিল দারুণ অর্থবহ। মানুষ আত্মবিশ্লেষণ করতে চাইলে সত্যস্বরূপ ভগবান তাকে সহায়তা করেন।

সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রমুখকে দূরে রেখে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে নিজের রথে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন নগরের বাইরে এক নির্জন প্রান্তে। প্রাথমিক কিছু কথাবার্তার পর তিনি কর্ণকে বললেন, ‘‘কর্ণ! আমি জানি, তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের আপনি অনেক সেবা করেছেন, তাঁদের ভরণ-পোষণ করেছেন। সুতরাং ধর্মশাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিষয়গুলি সবই আপনার জানা। কন্যাকালে জাত পুত্রের নাম ‘কানীন’। তার কুমারী মা পরে বিবাহ করেন যে-পুরুষকে, তাঁর ‘সহোঢ়’ পুত্র সে। শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে আপনি তাই পাণ্ডুরই পুত্র। সুতরাং আপনিই হবেন রাজা। পিতৃকুলে পাণ্ডবরা এবং মাতৃকুলে আমরা রয়েছি আপনার সহায়।’’

মহাভারতের পৃষ্ঠায় কর্ণের সামনে এই প্রথম উন্মোচিত হচ্ছে তাঁর পিতৃপরিচয়। কিন্তু তিনি বিস্ময়করভাবে শান্ত! যেন আগে থেকেই জানেন সবকিছু! কোনও কথা বলছেন না, শুধু শুনে যাচ্ছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ‘‘পাণ্ডবদের সাহায্যের জন্য যেসব রাজা সমাগত হয়েছেন, তাঁরা বরং আপনারই রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করুন। যুধিষ্ঠির হোন আপনার যুবরাজ, ভীম আপনার মস্তকে ধরুন শ্বেতছত্র, অর্জুন ধরবে আপনার রথের রশি। নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং আমরা যাদবরা করব আপনার অনুগমন। আপনি নিশ্চিন্ত মনে সানন্দে রাজ্য পরিচালনা করুন। সূত-মগধরা আপনার জয়ধ্বনি দিক। দেবী কুন্তী আনন্দলাভ করুন।’’[১]

স্পষ্টতই এটা প্রলোভন। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে নানাভাবে যে প্রলুব্ধ করছেন, তার কারণ—তিনি জানেন কর্ণের জীবনে এই আক্ষেপটাই আছে। এই প্রতিষ্ঠাই তিনি পেতে চেয়েছিলেন একদিন—ঠিক পাণ্ডবদের সঙ্গে না হলেও, এমনভাবে সেই প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনে আসুক যাতে সূতপুত্ররূপে নয়—যথার্থ এক ক্ষত্রিয় রাজারূপে তাঁর পরিচিতি হোক। কেননা এটাই তো তাঁর জন্মগত অধিকার। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে, তাঁর জীবন এখন এমন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছে—যেখান থেকে নতুন কিছু শুরু করা আর সম্ভব নয়, বরং যে-জীবনধারাটি প্রবাহিত হয়ে চলেছে—সেটিকেই এবার পরিণামমুখী করা দরকার।

স্মিত হেসে কর্ণ বললেন, ‘‘কৃষ্ণ! আপনি যা বললেন তা সত্যিই যথার্থ সুহৃদের মতো। আমার পিতৃপরিচয় আমি জানি। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে আমি পাণ্ডুরই পুত্র। [লক্ষণীয়, কুন্তীর সঙ্গে তাঁর তখনও সাক্ষাৎ হয়নি। এর পরে হবে।] দেবী কুন্তী কন্যা অবস্থায় সূর্যদেবের কাছ থেকে আমাকে লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে যেভাবে ত্যাগ করলেন, তাতে কখনই মঙ্গল হতে পারে না। সেক্ষেত্রে সারথি অধিরথ আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে এলেন এবং দেবী রাধা আমাকে নিজের সন্তানের মতো লালন-পালন করে বড় করলেন—এর কোনও তুলনাই হয় না। তাঁরা যেমন আমাকে নিজের পুত্র ভাবেন, আমিও তেমনি তাঁদেরই আমার পিতা-মাতা মনে করি। তাঁদের ত্যাগ করা

আমার পক্ষে কখনই ধর্মসংগত নয়।”[২]

দেখা যাচ্ছে, কর্ণ তাঁর অতীত জীবনের কথা সবটাই জানেন। কবে কার কাছ থেকে তিনি এসব জেনেছেন তার উল্লেখ নেই মহাভারতে। সূর্যদেব যে তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে কবচকুণ্ডল ত্যাগ না করতে বলেছিলেন, সেই ঘটনা বিবৃত করে মহর্ষি ব্যাস জানাচ্ছেন—সূর্যদেব কর্ণকে তাঁর জন্মবৃত্তান্তের কথা কিছুই বলেননি। দেবরাজ ইন্দ্র সেদিন তাঁকে বলেছিলেন, ‘‘তোমার পিতার যেমন বর্ণ ও তেজ, তোমারও তেমনি বর্ণ ও তেজ হবে।” যদিও সেসময় কর্ণের মনে তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি, হয়তো ভেবেছিলেন—ইন্দ্রদেব ‘পিতা’ বলতে তাঁর ইষ্টদেবকে বুঝিয়েছেন। হয়তো এর পরে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে এবং কেউ তার মীমাংসা করে দিয়েছে। আর এইসকল বৃত্তান্ত জানার পরে কর্ণের অন্তরে যে কী ভীষণ যন্ত্রণা, অভিমানের সৃষ্টি হয়েছে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। এই যন্ত্রণাই তাঁর মধ্যে এনেছে ক্রোধ এবং তীব্র পাণ্ডব-বিদ্বেষ। বিপরীতদিকে, খুব সংগতভাবেই, আশ্রয়দাতা অধিরথ এবং প্রতিষ্ঠাদাতা দুর্যোধন হয়েছেন তাঁর সবচেয়ে আপনার।

কর্ণ বলছেন, ‘‘জনার্দন! ছোটবেলা থেকে আমার যা কিছু করার—সেই মলমূত্র পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে নামকরণ, শিক্ষা-সংস্কার করা, বিবাহ দেওয়া সবই করেছেন আমার পিতা-মাতা—অধিরথ ও দেবী রাধা। আমার স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র—সবাইকে নিয়ে আমি সুখেই আছি। পৃথিবীর কোনও ঐশ্বর্যই আমাকে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।” বলতে বলতে আবেগঘন হয়ে এল কর্ণের কণ্ঠ—‘‘আজ তেরো বছর হয়ে গেল, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে দুর্যোধনের আশ্রয়ে বিনা বাধায় রাজ্যভোগ করে এসেছি, বহু যাগযজ্ঞ করেছি। দুর্যোধন আমার ওপর ভরসা করেই এত বড় যুদ্ধের আয়োজন করেছে। অর্জুনের প্রতিষেধক হিসেবে সে আমাকেই মনোনীত করেছে। আমি কী করে দুর্যোধনের সঙ্গে আজ বিশ্বাসঘাতকতা করব? আর একটা কথা কৃষ্ণ, অর্জুনের সঙ্গে যদি আমার দ্বৈরথ না হয় তাহলে তা আমাদের দুজনের পক্ষেই হবে নিন্দনীয়। আপনি আমার এবং পাণ্ডবদের মঙ্গলের জন্যই যে এসব কথা বলছেন, সেটা বুঝতে পারছি; কিন্তু আপনাকে আমার অনুরোধ—আমাদের মধ্যে গোপনে আজ যে-কথা হল সেটা পাণ্ডবরা যেন জানতে না পারে।”[৩]

এরপরেই একটা অদ্ভুত কথা বললেন কর্ণ, যা ইতিপূর্বে কখনও তাঁর মুখে আমরা শুনিনি। শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য তিনি জানেন বলেই ধীরে ধীরে আত্ম-উন্মোচন করছেন তাঁর সামনে। কর্ণ বলছেন, ‘‘মধুসূদন! যুধিষ্ঠির যদি জানতে পারে আমি ওর দাদা, তাহলে সে কখনই রাজ্য গ্রহণ করবে না, আমি জানি। আমাকেই সব দিয়ে দেবে। কিন্তু আমাকে দিলে আমি যে তা রাখতে পারব না নিজের কাছে—সব দিয়ে দিতে হবে দুর্যোধনকে। সেটা ঠিক হবে না। বরং রাজা হোক যুধিষ্ঠিরই। সেটাই হবে যথার্থ। আর হৃষীকেশ যার নেতা এবং অর্জুন যার যোদ্ধা—সে রাজা হবে নাই বা কেন! তাছাড়া ভীম, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি এবং আরও কত শত মহাবীর আছে তার সঙ্গে। তার তো যুদ্ধজয় হয়েই গেছে। অবশ্য দুর্যোধনের পক্ষেও বিশাল ক্ষত্রিয়সমাজ রয়েছে।... কৃষ্ণ! আমি দুর্যোধনকে আনন্দ দেওয়ার জন্য পাশাখেলার সভায় পাণ্ডবদের যে-কটুকথা বলেছিলাম, তার জন্য এখন খুব অনুতাপ হয়। যখন আপনি আমাকে অর্জুনের হাতে নিহত দেখবেন, তখনই দুর্যোধনের যুদ্ধযজ্ঞের বৃদ্ধি হবে। পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি পাবে যখন ভীম দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপান করবে। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর হাতে দ্রোণ ও ভীষ্ম নিপাতিত হওয়ার পর যখন ভীম দুর্যোধনকে বধ করবে, তখনই শেষ

হবে এই যুদ্ধযজ্ঞ। আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে কেশব, এই যুদ্ধে যেসব ক্ষত্রিয় প্রাণত্যাগ করবে—তারা সকলেই যেন স্বর্গলাভ করতে পারে। তাদের কীর্তিকথা যেন চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকে। যুদ্ধ জয় করে যেমন যশোলাভ হয়, তেমনি বিক্রম প্রকাশ করে মৃত্যুবরণ করলেও হয়। ব্রাহ্মণরা চিরকাল এই মহাযুদ্ধের কথা বলবেন। কৃষ্ণ! আমার জন্মবৃত্তান্ত গোপন রেখে আপনি অবশ্যই অর্জুনকে নিয়ে আসবেন আমার সামনে।”[৪]

অর্থাৎ কর্ণের কাছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চিত্রটি আগে থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। কে কোন কর্মের কী ফল ভোগ করবে, কোনটা উচিত আর কোনটা অনুচিত—সবই তিনি বুঝতে পারছেন। তবে এটা ভাবলে ভুল হবে, ভবিষ্যতে কর্ণ আর আগের মতো উগ্র, অসহিষ্ণু বা দুর্মুখ থাকবেন না। না, তিনি বাহ্যত প্রায় একইরকম থাকবেন, আগের মতোই দুর্যোধনকে যুদ্ধের জন্য তাতিয়ে যাবেন (যদিও মনে মনে জানেন, অবধারিত পরাজয় ও মৃত্যু ধেয়ে আসছে দুর্যোধনের জীবনে), আত্মশ্লাঘা করবেন, হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়বেন অশ্বত্থামার সঙ্গে, অর্জুন-ভীম-অভিমন্যুর হাতে বারবার পর্যুদস্ত হবেন এমনকী কখনও কখনও হতাশও হয়ে পড়বেন; কিন্তু যে-আত্মবিশ্লেষণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে তাঁর মধ্যে তা জারি থাকবে আমৃত্যু। আর কে না জানে, এই আত্মবিশ্লেষণের পথ ধরেই মানুষ ক্রমশ উন্নত হয়।

কর্ণের এই কৃতজ্ঞতাবোধ, মৃত্যু এবং পরাজয় নিশ্চিত জেনেও নিজের বিশ্বাস ও আদর্শের প্রতি সৎ থাকা আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু যে-উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের কাছে প্রস্তাব রেখেছিলেন তা কিন্তু সফল হয় না। তাঁর কাছে প্রাধান্য পায় গণমানুষ—ব্যক্তিমানুষ ততটা নয়। যে-যুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে তাতে শুধু কৌরব বা পাণ্ডবরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, মারা পড়বে লক্ষ লক্ষ মানুষ—যারা নিরপরাধ, যাদের কাছে এই যুদ্ধ না নিয়ে আসবে রাজ্য-ঐশ্বর্য, না আনবে যশ, প্রতিষ্ঠা। শুধু তাই নয়, দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার চূড়ান্ত অবনতি ঘটে যাবে; এর কুপ্রভাব হবে সুদূরবিস্তারী। তাই কর্ণের কথাগুলি শুনতে ভাল লাগলেও তৃপ্ত করতে পারল না শ্রীকৃষ্ণকে। খানিক অসন্তোষের সঙ্গেই যেন তিনি মৃদু হাস্যে বললেন, ‘‘কর্ণ, আমি যে আপনাকে রাজ্যলাভের প্রস্তাব দিলাম সেটা গ্রহণ করলেন না। পাণ্ডবদের বিজয় হবে, সে তো অবশ্যই। অর্জুনের রথশীর্ষে তার শুভলক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।... সমরাঙ্গনে অর্জুন যখন ভয়ংকর সব দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করবে, কিংবা যজ্ঞশীল যুধিষ্ঠির যখন সূর্যসম তেজে শত্রুপক্ষকে সন্তপ্ত করবেন, বা মহাপরাক্রমী ভীম দুঃশাসনের রক্তপান করে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রলয়কাণ্ড বাধাবেন তখন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর বলে কোনও যুগই আর থাকবে না। আপনি ফিরে গিয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপকে বলবেন সাতদিন পরে অমাবস্যা তিথিতে আমাদের দেখা হচ্ছে কুরুক্ষেত্রে। এই যুদ্ধে যাঁরা দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করতে উপস্থিত হয়েছেন, সেইসব রাজাদের যুদ্ধতৃষ্ণা আমি মিটিয়ে দেব।”[৫]

শ্রীকৃষ্ণের কথার মধ্যে যে-তেজ ও প্রতাপ প্রকাশিত হয়েছে তা নজর এড়ায়নি কর্ণের। তিনি বিনীতভাবে বললেন, ‘‘মহাবাহু! এক বিরাট ধ্বংসের মুখে যে এই দেশটা দাঁড়িয়ে আছে তা আমিও জানি। তবুও আপনি আমাকে সম্মোহিত করতে চাইছেন কেন? আমি তো জানি, দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি এবং আমিই এই যুদ্ধের জন্য দায়ী। আর চারিদিকে যে-দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাতেই বুঝতে পারছি দুর্যোধনের পরাজয় এবং যুধিষ্ঠিরের জয় নিশ্চিত।” এরপর নানা অশুভ লক্ষণের কথা বলে কর্ণ শোনালেন তাঁর এক অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত—‘‘আমি স্বপ্নে দেখেছি—যুধিষ্ঠির তার ভাইদের নিয়ে

এক বিশাল প্রাসাদে অবস্থান করছে। আপনি এই জগৎটাকে তার হাতে তুলে দিয়েছেন। বহু মানুষের মৃতদেহের ওপর তার সিংহাসন পাতা। ভীমকর্মা ভীমসেন গদাহস্তে যেন সারা জগৎটাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। আমার জানা আছে—ধর্ম যেখানে জয়ও সেখানে। 'বিদিতং মে হৃষীকেশ! যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'। আমি স্বপ্নে এও দেখেছি, গাণ্ডীবধারী অর্জুন শ্বেতহস্তীর পিঠে আরোহণ করে অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। দুর্যোধন এবং আর সকল বীরই যে আপনাদের হাতে নিহত হবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই আমার।... বেঁচে থাকবে শুধু তিনজন—অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মা। জনার্দন, আমি স্বপ্নে দেখেছি—ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন এবং আমি উষ্ট্রচালিত রথে দক্ষিণ অভিমুখে যাচ্ছি। এ তো সাক্ষাৎ বিনাশের লক্ষণ।... গাণ্ডীবের আগুনেই আমরা সকলে ভস্মীভূত হয়ে যাব।"[৬]

হতাশ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ''আমার কথা যখন আপনি রাখলেন না তখন বিপুল লোকক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। মহাপ্রলয় এলে মানুষের বুদ্ধি এভাবেই বিভ্রান্ত হয়।"[৭]

কর্ণ উত্তর দিলেন : ''হে মহাবীর! হয় আমরা এই যুদ্ধে বেঁচে ফিরে আপনাকে দেখব, নয়তো স্বর্গে গিয়ে আপনার সঙ্গে নিশ্চয় মিলিত হব। এখন তবে আসি?"[৮] অনুমতি দিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরলেন কর্ণ। তারপর তাঁর রথ থেকে নেমে নিজের রথে উঠে যাত্রা করলেন হস্তিনাপুরের উদ্দেশে। শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকিকে নিয়ে ফিরে গেলেন উপপ্লব্য নগরে—পাণ্ডবদের কাছে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস যেন ছড়িয়ে পড়ল মহাভারতের বুক জুড়ে।

একথা সত্য, এমন কর্ণকে আমরা ইতিপূর্বে দেখিনি। নিজের মনের কথা এভাবে কারও কাছে উজাড় করে দেননি তিনি। শ্রীকৃষ্ণ এই সুযোগটা করে না দিলে তিনি কোনওদিন বলতেও পারতেন না, আমরাও জানতে পারতাম না কী রয়েছে কর্ণের অন্তরে। আর ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে তো কখনও সত্য গোপন করা যায় না!

শ্রীকৃষ্ণ কি জানতেন না কর্ণের ভবিতব্য? জানতেন, খুব ভালভাবেই জানতেন। তাঁর অজানা কিছু নেই—ভীষ্ম থেকে শুরু করে অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র—কার কীভাবে কখন মৃত্যু হবে সবই জানতেন তিনি। তার প্রমাণও আছে মহাভারতে। কিন্তু লক্ষণীয়, কারও ক্ষেত্রেই যেখানে তিনি বিধিলিপি পরিবর্তনের চেষ্টা করেননি, সেখানে একমাত্র কর্ণের ক্ষেত্রেই তা করতে গেলেন। দুর্ভাগ্য, ভগবানের ইচ্ছাও প্রতিহত হয়ে গেল মানুষের প্রকৃতি, প্রারব্ধ এবং কর্মফলের কাছে। আমাদের কাছে এ এক বিরাট শিক্ষার বিষয়।

শ্রীকৃষ্ণ আবারও একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসেছিলেন কর্ণের কাছে—যেদিন শুরু হচ্ছে যুদ্ধ। তখন নিশ্চিত হয়েই গেছে ভারতব্যাপী এক বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ—যা তিনি প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন সর্বতোভাবে। তাহলে আবারও কেন তাঁর এই প্রয়াস? এদিন তিনি একটু অন্যভাবেই কথাটা বললেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে বললেন, ''শুনলাম আপনি নাকি ভীষ্মের প্রতি বিদ্বেষবশত তাঁর সেনাপতিত্বে যুদ্ধ করবেন না; তা তিনি যতদিন না দেহরক্ষা করছেন ততদিন আপনি আমাদের পক্ষে থেকেই যুদ্ধ করুন না, যদি আপনার কাছে দু-পক্ষই সমান হয়! যদি দুর্যোধনকে সাহায্য করা কর্তব্য বলে মনে করেন তাহলে ভীষ্ম নিহত হলে না হয় দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করবেন।"[৯]

অনেকেই বলবেন, এসব শ্রীকৃষ্ণের কূটনীতি। হতেই পারে। কেননা মহাভারতের আসরে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন রাজনীতিবিদ হিসাবে। কূটনীতি রাজনীতির অপরিহার্য এক অঙ্গ। তবে এই কূটনীতির পিছনে শ্রীকৃষ্ণের কোনও দুরভিসন্ধি নেই। ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই। অন্যের ক্ষতি করার অভিপ্রায়

নেই। তাঁর উদ্দেশ্য মনে হয় দুটো—প্রথমত, দুর্যোধনকে হতোদ্যম করে দিয়ে যুদ্ধ বন্ধের মরিয়া চেষ্টা, এবং দ্বিতীয়ত, কর্ণকে রক্ষা করা। একবার তিনি পাণ্ডবপক্ষে এলে সৌহার্দ্য স্থাপনের একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। না, কর্ণের হাত থেকে অর্জুনকে বাঁচানো শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য নয়। কেননা ইন্দ্রদেব কর্ণকে একাঘ্নী বাণ দেওয়ার সময়ই বলে দিয়েছিলেন—''একজন মাত্র গর্জনকারী শক্তিমান পুরুষকেই এটা দিয়ে বধ করা যাবে। তারপরেই ওটা ফিরে আসবে আমার কাছে।... কিন্তু যার জন্য এটা চাইছ, তাকে রক্ষা করছেন স্বয়ং ভগবান।''[১০] এটা জানতেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই অর্জুন বা পাণ্ডবদের প্রয়োজনে নয়, কর্ণকে বাঁচানোর জন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে এমন প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, কর্ণ এই প্রস্তাবে সম্মত হননি। তিনি বলেছিলেন, ''কৃষ্ণ! আমি দুর্যোধনের কোনও অপ্রিয় কাজ করব না। আমি তার শুভাকাঙ্ক্ষী। আপনি জেনে রাখুন, দুর্যোধনের জন্য আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।''[১১] বস্তুত কৃতজ্ঞতারক্ষাকে, মানুষের বিশ্বাস ভঙ্গ না করাকে কর্ণ এতখানি গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়েছিলেন যে, পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্রকে হারিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করতেও তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। এ তাঁর প্রকৃত পৌরুষ, বীরত্ব—সন্দেহ নেই।

কেউ কেউ বলেন—নৈতিকতার মানদণ্ডে, বাহ্যদৃষ্টিতে, তাঁর কাছে শ্রীকৃষ্ণের পরাজয় ঘটল। কিন্তু সত্যিই কি তাই? শ্রীকৃষ্ণ কি জানতেন না কর্ণের ওপর ব্রাহ্মণের অভিশাপ? সবই জানতেন। তবু এমন একটা প্রস্তাব করলেন দেশকে বাঁচানোর জন্য, এক ভাগ্যহত মহাবীরকে বাঁচানোর জন্য। তাঁর এই সর্বজনের কল্যাণকামনার কাছে গুরুত্ব হারিয়েছিল দ্রৌপদীর অপমান এবং পাণ্ডবদের ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছাও। অর্থাৎ কর্ণ যেখানে নিজের চারিত্রিক উন্নতিতে সচেষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ সেখানে সর্বজনের কল্যাণে উন্মুখ। লোকচক্ষুর আড়ালে গিয়ে কর্ণকে ওই প্রস্তাব দিলেও দিব্যদৃষ্টির অধিকারী সঞ্জয়ের মাধ্যমে যে জেনে যাবে বিশ্ববাসী, এর জন্য তাঁকে হয়তো কেউ অপবাদও দেবে—এসব জেনে-বুঝেও শ্রীকৃষ্ণের এই মহান প্রয়াস সর্বকালের সর্বজনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে নিয়েছে। রাজনীতির উদ্দেশ্য যে সর্বজনের কল্যাণ—এটি দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি।

মনে পড়ে তাঁর সেই কালজয়ী কথাটি—'পরিত্রাণায় সাধূনাং'—সাধুদের পরিত্রাণের জন্যই তাঁর মর্তধামে অবতরণ। এই সাধুত্ব মানুষের বাহ্য আবরণ বা চিহ্ন নয়—তা একান্তই অন্তরের ঐশ্বর্য। এই সাধুত্ব বা দেবভাব কর্ণের মধ্যে ছিল বলেই তাঁকে 'পরিত্রাণ' করতে চেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান এমনই করুণাময়; কিন্তু তুচ্ছ অহংকার- অভিমানের বশে মানুষ সেই করুণাকে প্রতিফলিত করতে পারে না নিজ জীবনে। কৃষ্ণ-কর্ণ-সংবাদের মধ্য দিয়ে এই বার্তাই আমাদের দিলেন মহাকবি ব্যাস।

তথ্যসূত্র

১। মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, *মহাভারতম্*, বঙ্গানুবাদ : শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, উদ্যোগপর্ব, ১৩১।৬-২৭

২। তদেব, ১৩২।১-৮

৩। তদেব, ১৩২।৯-২০

৪। তদেব, ১৩২।২১-৫৭

৫। তদেব, ১৩৩।২-১৯

৬। তদেব, ১৩৪।২-৪৫

৭। তদেব, ১৩৪।৪৬-৪৭

৮। তদেব, ১৩৪।৪৮-৪৯

৯। তদেব, ভীষ্মপর্ব, ৪৩।৮৫-৮৬

১০। তদেব, বনপর্ব, ২৬৪।২৩,২৫

১১। তদেব, ভীষ্মপর্ব, ৪৩।৮৭